



মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে শোষিতের সহযোদ্ধা রূপে প্রকৃতির প্রতীকে উত্তরন

Tanay Roy

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

Abstract: মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে প্রকৃতির উপস্থিতি নিছক সৌন্দর্যের বর্ণনা বা অলংকার নয়; বরং তা প্রান্তিক আদিবাসী ও শোষিত জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম, আত্মপরিচয় এবং সামাজিক বঞ্চনার এক গভীর প্রতীকী মাধ্যম। বঙ্কিমচন্দ্র, তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের ধারাবাহিকতায় মহাশ্বেতা দেবী প্রকৃতিকে গল্পে এক স্বতন্ত্র ও প্রতিবাদী সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য গবেষণাধর্মী নিবন্ধে তাঁর বিখ্যাত গল্প ‘ভারতবর্ষ’, ‘অর্জুন’, ‘বিছন’, ‘অন্ন, অরণ্য...’, ‘শূন্যস্থান পূর্ণ করো’ এবং ‘জল’-এর বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে কীভাবে রক্ষ প্রান্তর বঞ্চনার প্রতীক হয়ে ওঠে, আর শাল ও অর্জুন গাছ আদিবাসীদের সংস্কৃতি, আত্মসম্মান ও প্রতিরোধের দিশা দেখায়। একই সাথে সামাজিক বনসৃজনের নামে ইউক্যালিপটাস রোপণের বিরুদ্ধে প্রকৃতির নিজস্ব প্রতিবাদ এবং জলের মতো মৌলিক অধিকার থেকে নিচু জাতের মানুষদের বঞ্চিত করার ঘটনা উঠে এসেছে। সামগ্রিকভাবে, মহাশ্বেতা দেবী অরণ্য ও অরণ্যজীবী মানুষকে এক অভিন্ন সূত্রে গেঁথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকৃতির এক নীরব ও শক্তিশালী প্রতীকী উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

Key Words: মহাশ্বেতা দেবী, প্রকৃতির প্রতীক রূপ, আদিবাসী জীবনসংগ্রাম, অরণ্য ও সংস্কৃতি, সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিরোধ, স্বভাব অরণ্য বনাম সামাজিক বনসৃজন।

Introduction: ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতিকে আদিমকাল থেকেই রূপে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। মূলনিবাসীরা প্রকৃতিকে যেমন দেবতারূপে পূজা করে আসছে, তেমনই জন্মলগ্ন থেকেই সাহিত্য ও প্রকৃতি একে অপরের সঙ্গে অভেদ্যরূপে জড়িয়ে আছে। বৈদিক সাহিত্যেও প্রকৃতিকে মাতা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে-

“...মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।

পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তুঃ”^১

অর্থাৎ, এই ভূমি আমাদের মাতা এবং আমরা সবাই তাঁর সন্তান। মেঘ আমাদের পিতা এবং এই উভয়েই আমাদের রক্ষা বা পালন করেন। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি খুব সাধারণ বলে মনে হলেও এর পেছনে মূলত রয়েছে নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক কারণ। সৃষ্টির আদিমকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। একসময় অরণ্যই ছিল তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জোগানদার। এ কারণেই পরবর্তীকালে আদিম গুহাচারী মানব থেকে যখন তারা ধীরে ধীরে সভ্য মানুষে পরিণত হতে শুরু করল, সৃষ্টি করল শিল্প-সাহিত্য, তখনও তাদের অবচেতন মনে জেগে থাকল প্রকৃতি। তাই পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের প্রথম পর্ব বিশ্লেষণ করলে তাতে প্রকৃতির এক বিরাট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও শুরু থেকে দেখা যায় নিসর্গের চর্চা অল্পস্বল্প হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’ বা ‘চন্দ্রশেখর’-এ প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা যথেষ্টই রয়েছে। পরবর্তীকালে কথাসাহিত্য যখন বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তখন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে প্রকৃতি উপন্যাসের এক অনিবার্য অঙ্গ, এমনকি অনেক সময় প্রকৃতি নিজেই একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে

উঠেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, তার ব্যবহারেও রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। কখনও নিছক সৌন্দর্য প্রকাশে, কখনও উদ্দীপনা বিভাব হিসেবে, কখনও প্রতীক হিসেবে-এভাবে নানা রূপে, নানা বিভঙ্গে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছে মানুষ। এ যেন একই সঙ্গে জায়া, জননী, প্রেয়সী, কন্যা সব।

Discussion: মহাশ্বেতা দেবীর গল্পেও রয়েছে প্রকৃতির ব্যবহার এবং তা রয়েছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই। কারণ তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই মূল পটভূমি হল অরণ্য, আর তাঁর গল্পের চরিত্ররা এই অরণ্যভূমিরই সন্তান। তবে গতানুগতিকভাবে তিনি প্রকৃতিকে ব্যবহার না করে একই সঙ্গে প্রকৃতি এবং গল্প দু'টি বিষয়কেই এক অন্য মাত্রা দিয়েছেন, যা সচরাচর আমরা অন্যত্র দেখতে পাই না। তিনি তার গল্পগুলোতে প্রকৃতিকে মূলত দু'ভাবে ব্যবহার করেছেন- প্রতীকরূপে ও গল্পের মূল বিষয়বস্তুরূপে। তাঁর বহু গল্পের মূল সূত্রটি তিনি শুধুমাত্র প্রকৃতির দু'একটি সুতীক্ষ্ণ প্রতীকী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠককে ধরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রথমেই তাঁর 'ভারতবর্ষ' গল্পটির কথা উল্লেখ করতে পারি। গল্পটিতে পালামৌ জেলার এক ক্ষুদ্র, বঞ্চিত গ্রাম আটাই তালের কথা বলা হয়েছে, যে গ্রাম বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অবস্থান করেও আশ্চর্যজনকভাবে রয়ে গিয়েছে মধ্যযুগে। কারণ এই গ্রামে এখনও সভ্যতার কোনও ছোঁয়া পৌঁছোয়নি। যুগ যুগ ধরে পাওয়া বঞ্চনাই যে আটাই তাল গ্রাম তথা 'ভারতবর্ষ' গল্পটির মূল মোটিভ তা বিদগ্ধ পাঠক পূর্বেই আন্দাজ করতে পারেন গল্পের শুরুতে গল্পকারের দেওয়া কিছু প্রাকৃতিক বর্ণনা থেকে। তিনি জানিয়েছেন-

“আটাই গ্রামে পৌঁছতে হলে পাথুরে পথ ছেড়ে বাঁ দিকে ওঠার সময়ে প্রাগৈতিহাসিক বড়ো বড়ো পাথর, পুটুস ঝোপ ও হরিয়া ঘাসের ঝাড়ের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ। পথটি আড়াইবার বেঁকে গেছে মোচড় খেয়ে। বস্তুত আকাশ থেকে যদি কেউ ছবি তোলে, তাহলে অদ্ভুত জিনিস সে ছবিতে ধরা পড়বে। গোটা পালামৌ জেলাতে সম্ভবত এই একটি জায়গায় আজও প্রকৃতি রয়ে গেছে আদিম চেহারায়, অপরিবর্তিত। আটাই নদীটি তিরতির জলধারায় বহে এসে একটি বিশাল চেটালো পাথুরে পাহাড়ের পায়ের কাছে ঠিক আড়াইবার বাঁক নিয়ে এসে পড়ছে এক বিশাল বিস্তৃত হ্রদে। আসলে ওটা প্রাগৈতিহাসিক সময়ে সৃষ্ট কোনো খাদ। যে সময়ে পৃথিবীর ওপর থেকে পাতালে ধস নামছিল। পাতাল ফুঁড়ে উঠে আসছিল পাহাড়, সেই সময়ের খাদ। শত শত বছর ধরে জল পড়ছে আটাই নদীর। জল জমে জমে এক সুবিশাল হ্রদ। পালামৌয়ে পৃথিবী এমন রুক্ষ, নগ্ন, গরিব ও ত্রুন্ধ-কাঁকুরে প্রান্তর, ন্যাড়া পাহাড়, নিঃশেষিত অরণ্য ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে।”

-উদ্ধৃতাংশটিতে গল্পকারের 'আদিম' এবং 'প্রাগৈতিহাসিক' শব্দদুটির সচেতন ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে আটাই তাল গ্রামের বিশেষণ হিসেবে গল্পকার ব্যঙ্গার্থে শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন। এই প্রাকৃতিক রুক্ষতা ও নগ্নতা যে একই সঙ্গে আটাই গ্রাম তথা গ্রামবাসীদের দারিদ্র্যেরই এক প্রতীকী রূপ তা স্পষ্ট হয় কিছুটা পরেই যখন গল্পকার বলেন-

“আটাই গ্রামটিও অদ্ভুত। কাঁটা বাবলা জাতীয় বন্য গাছ, হরিয়া ঘাস ও ফণীমনসা। জমি কাঁকুরে। কিছু তফাত রেখে রেখে মারোয়ার, মুগা ও ওরাওঁদের টোলি। ...গ্রামে ঢোকান মুখে গাছের গায়ে গজাল মেরে বসানো এক টিনের পাতে আলকাতরায় লেখা আটাই, তহশীল ও ব্লক রামান্দা। আর কিছু নেই, কোনো চিহ্ন নেই বিশ শতকের। পথ, কুয়া, প্রাথমিক স্কুল, দোকান। আটাই হ্রদের পূর্ব পাড়ে কেউ ঘর করে নি। সরকারি দপ্তরে বনবিভাগীয় গ্রাম আটাইয়ের কথা বনবিভাগও ভুলে গেছে। এটাও এক অলৌকিক ঘটনা যে এত জল, একটি জনপদ, কয়েকটি মানুষ, এদের অস্তিত্ব কেউ মনে রাখে নি।”

-প্রকৃতি যেমন তার অপার সম্পদ হতে বঞ্চিত করেছে আটাই গ্রামকে, ঠিক তেমনিভাবে সরকারি প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি সংস্কার, অরণ্যপূর্ত, কৃষি-আদিবাসী কোন বিভাগের কাছ থেকেও আটাই গ্রাম কিছু পায়নি। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বর্ণনা যেন 'ভারতবর্ষ' গল্পটির মূল মোটিভ এবং প্রেক্ষিত দুটোকেই দারুণভাবে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে।

আদিবাসী সমাজে শাল, অর্জুন প্রভৃতি গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। এইসব গাছ যেমন তাদের খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে, তেমনি তারাও গাছদের নিজেদের সংস্কৃতিরই এক অঙ্গ বলে মনে করে। অর্জুন গাছকে তারা দেবতার সম্মান দেয়। ফলে অর্জুন গাছের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের আত্মসম্মানের প্রশ্ন, যে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হলে দোদণ্ডপ্রতাপ মহাজনের বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়াতেও তারা দ্বিধা বোধ করে না। ঠিক এরকম একটি মননশীল বিষয় নিয়েই মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন ‘অর্জুন’ নামক গল্পটি, যার মূল ভরকেন্দ্রে রয়েছে একই সুবিশাল প্রাচীন অর্জুন গাছ। গল্পে দেখা যায় আদিবাসী গ্রাম বানডিজির তেমাথায় রয়েছে এক সুবিশাল তেজস্বী, সুন্নত অর্জুন গাছ, যে গাছ আদিবাসীদের কাছে যেন এক গ্রামপ্রহরী-

“একদা লক্ষ লক্ষ গাছ সৈন্য হয়ে ভূমিরক্ষা করত। এখন ও একা। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সহযাত্রীদের স্মৃতি যেন ওকে একক ও অতন্ত্র করে দিয়েছে। ও ওর সাধ্যমতো মানভূমের উপেক্ষিত লুপ্তিত ভূমিকে পাহারা দিচ্ছে।”^৪

-এই গাছের ওপরেই দৃষ্টি পড়ে গ্রামীণ নেতা বিশাল মাহাতোর। সে কেতু শবরকে চাপ দেয় গাছটি কেটে ফেলার জন্য। কেতু শবর বলে-

“বাবু আমার দিন গেলে চারটি টাকা চাই। গাছ কাটতে বল, কেটে দেব, মানুষ কাটতে বলো, কেটে দেব।”^৫

-যদিও টাকার এত প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও বিশাল মাহাতোর কথায় কেতু শবর গাছ কাটার জন্য অন্তর হতে সায় পায় না। কারণ-

“ওই গাছ জমিদারি আমলে বানডিহি জঙ্গলের শেষ প্রতীক। গাছটি দেখলে কেতুদের এখনো অতীতকে মনে পড়ে। যখন জঙ্গলের মত জঙ্গল ছিল, যখন শবররা ছিল বনজীবী। বাইরের মানুষ দেখলে যখন ওরা ত্রাসিত খরগোশ বা খেড়িয়ার মতো বনের পেটে ঢুকে যেত, সেসব দিনের কথা। বৃদ্ধবৃদ্ধারা গাছটিকে বড় মানে, দেবাংশী গাছ।”^৬

বিশাল মাহাতোর কাছ হতে হাত পেতে দশ টাকা নিলেও পরম ভাবিত হয়ে কেতু শবর যায় বনমালী, দিগা, পীতাম্বর শবরদের কাছে। প্রচুর মদ, টাকার লোভ থাকলেও কেতুর মতই তারাও গাছ কাটার সপক্ষে মত দিতে পারে না। তাদেরও মনে জাগে নানা স্মৃতি, নানা কথা, কেতুর আনা চুল্লুর নেশায় ডুবে গিয়ে চারটি শবর ভাবতে থাকে-

“বিয়েতে পরবে হোথা মেয়ে ঢোল ধামসা বাজাই, মানসিকের চুল ফেললে হোথা পুঁতে দেই। ওষধি বৃক্ষ হে, দিগার নানা তা জানত। পীতাম্বর অক্ষুটে বলে, সাঁওতালরা বাধনা জাগরণে গরু নাচাতে আসে। ওই গাছটি যখন, তরুণ ছিল, ওর নীচে পূজা দিয়ে সবাই শিকার পরবে যেত। এমন বার্ষিক্যে বা ওর রূপ কত। শাদাটে গা মাথাটি অপশে পূর্ণচাঁদের মায়ায় গাছ আর জ্যোৎস্না যেন এক হয়ে যায়। চৈত্র-বৈশাখে দেখো, ছায়া ছড়ায়। তেমাথার গাছটি... পীতাম্বর বলে। কতকাল আমাদের পাহারা দিয়ে রেখেছে হে। বন বলতে ও একা, বনের সপ্তম বলতে আমরা ক-ঘর। ওই গাছই চাই?... যখন ঘর বাঁধি নাই, ওই গাছের নীচে কতদিন থাকলাম... তা বাদে তো মাহাতোর ঘরের জমি দিল... দিগা বলে, সাঁওতালদের ঘর জ্বালাল রামবাবু, তা তারা এসে থাকে নাই?...^৭

ক্রমে ক্রমেই গাছটির বিষয়ে নানা কথা মনে পড়ে নানাজনের এবং কয়েকটি মানুষ, যাদের সরকার ও সমাজ বারবার শুধু উচ্ছেদ করে, ব্যবহার করে, জেলে দেয়, ভাসিয়ে দেয়, তারা সহসা বোঝে যে গাছটির অবস্থা তাদেরই মতো। ওদের মনে হয় কোথায় যেন বুকের ভেতর লাগছে। এই অনুভূতি থেকেই শেষ পর্যন্ত তারা আশ্রয় নেয় ধূর্ত কৌশলের, যে কৌশল রাম হালদার, বিশাল মাহাতাদের কাছ থেকেই তাদের শেখা। দিগা শবর বিশালবাবুর কাছ থেকে একশো টাকা নিয়ে গাছ কাটার আশ্বাস দিয়ে তাকে টাউনে পাঠিয়ে দেয় ভোটের মিটিং করতে। এদিকে বিশালবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে গাছ কাটা বাবদ প্রাপ্ত টাকা দিয়ে টাউনে চলে গেলে তারা অর্জুন গাছটির চারপাশ পাথর দিয়ে ঘিরে থান বাঁধে, পূজো দেয়। গাছটিকে তারা গ্রামদেবতা বলে ঘোষণা করে দেয়। সকলকে একথাও তারা জানিয়ে দেয় যে, দিগা শবর স্বপ্ন পেয়েছে বলেই বিশাল মাহাতো থান করার জন্য একশো টাকা দান করেছে। ফলে চারদিক থেকে দলে দলে সাঁওতাল, খেড়িয়া, সহিস, ভূমিজ, নানা জাতি আসতে থাকে পূজো দিতে। গাছটিকে ঘিরে মেলা বসে যায়। আর টাউনের মিটিং সেরে গ্রামে ঢুকে উত্তেজিত ও বোকা বনে যাওয়া বিশাল মাহাতো পরাজয়ের বহরটা বুঝতে সামনে এগিয়ে যায়-

“ভিড়, কী ভিড়। কেতু ঢোলক নিয়ে নাচছে। ঘুরে ঘুরে নাচছে। বিশাল কেন যেন ভয় পায়, দুর্বল বোধ করে? এই গাছ, এই মানুষ, সবাই তার চেনা। এদের আজ কেন অচেনা মনে হচ্ছে? ভয়, ভীষণ ভয়!”^৮

‘অর্জুন’-এর মতোই আর-একটি প্রতীকধর্মী গল্প ‘বিহ্ন’। ‘অর্জুন’ গল্পে অর্জুন গাছ যেমন সংস্কৃতি ও সম্মানের প্রতীক হয়ে সকল আদিবাসীদের মনে শক্তি জুগিয়েছিল তেমনই ‘বিহ্ন’ গল্পে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম প্রকৃতিতে লীন হয়ে এক চিরন্তন রূপ পায়। গল্পকার গল্পটির শুরুও করেছেন এক প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে, যে দৃশ্য গল্পটির শুরুতেই পাঠকের মনে কিছু প্রশ্নও জাগিয়ে তোলে-

“কুরুডা ও হেসাডি গ্রামের উত্তরে জমি টেউ খেলানো, একেবারে রোদে জ্বলা। বৃষ্টির পরও এখান ঘাস জন্মায় না। মাঝে মাঝে ফণীমনসার জঙ্গল ফণা তুলে থাকে, কয়েকটি নিমগাছ। এই দক্ষ ও আন্দোলিত প্রান্তর, যেখানে মোষ চরতে দেখা যায় না, তারই মাঝামাঝি একটি ডোঙা আকারের নাবাল জমি। জমিটি আধাবিঘা হবে। উঁচু পাড়ে উঠলে তবে জমিটি চোখে পড়ে এবং সবুজের সমারোহ দেখে ব্যাপারটি ভুতুড়ে লাগে। আরো ভুতুড়ে লাগে, জমির মাঝে কাঠের মুটির ওপর মাচা ও ছাউনি দেওয়া ঘর দেখে। এই জমিতে ঘর খুব অস্বস্তিকর। দর্শকের চোখে। কেননা, এরকম ঘর থাকে ফসল পাহারা দিতে, এজমিতে শুধু আনারস গাছের মতো সঙ্কটক এলোগাছ। মোষও খায় না।... সবচেয়ে ভুতুড়ে দৃশ্যটি দেখা যায় সন্ধ্যার মুখে। কুরুডা গ্রামের দিক থেকে লম্বা পা ফেলে একটি মানুষ এদিক পানে আসে। কাছে এলে দেখা যায় সে বুড়ো, চামড়া পাকানো পাকানো, কোমরে কোনি, কোমর থেকে একটি কাঁথার বটুয়া বুলছে। হাতে ওর লাঠি থাকে ও এলোগাছের গায়ে এলোপাখাড়ি লাঠি মারতে মারতে ও মাচানের কাছে যায়। গাছের ডাল-কাটা, অত্যন্ত নড়বড়ে এক মই ধরে ও ওপরে ওঠে। চকমকি ঠুকে বিড়ি ধরায়, বসে থাকে মাচানে। প্রত্যহ। অন্ধকার ঘনালে কোনা এক সময়ে ও চাটি পেতে ঘুমিয়ে পড়ে প্রত্যহ।”^৯

-গল্পের এতটুকু পড়ার পরই সচেতন পাঠকের মনে খুব স্বাভাবিকভাবেই দু’টি বিষয়ে কৌতূহল দেখা দেয়। প্রথমত, চারদিকের প্রান্তর রক্ষা হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যবর্তী এক টুকরো জমি কীভাবে পরিপূর্ণ সবুজ হয়? এবং দ্বিতীয়ত, কী কারণে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এলোগাছ ও পুটুস গাছ একজন সুস্থ, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি রাত জেগে পাহারা দেয়? আসলে এই প্রশ্নদুটির উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমগ্র গল্পটির প্রাণভোমরা। এভাবে মহাশ্বেতা দেবী শুরুতেই অতি সাধারণ একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাহায্যে পাঠককে মূল গল্পটির একটি সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, যে সূত্র ধরে গল্পের শেষ পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায় মানুষ ও প্রকৃতি একে অপরের সঙ্গে লীন হয়ে গেল।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কিছু গল্পে প্রকৃতিকেই গল্পের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ‘অন্ন, অরণ্য, অন্ন, অরণ্য..’ গল্পটি বিষয়বস্তু এবং রচনাভঙ্গি উভয় দিক দিয়েই স্বতন্ত্র। সরকার কর্তৃক স্বভাব অরণ্য উৎপাটন এবং তৎস্থানে সামাজিক অরণ্য সৃজনই এই গল্পের মূল অবলম্বিত বিষয়। গল্পটির শেষে দেখা যায় এই সামাজিক অরণ্যকে স্বভাব অরণ্য নিজেই সমূলে উৎপাটিত করে তার পূর্ববাসভূমি দখল করছে। অন্যদিকে গল্পের এক অন্যতম চরিত্র অন্নবালার কাছ থেকে-

“-তুরাদের দিএঃ হামার কুন্-অ কাজ নাই। অকাজুয়া গাছ যত ফল নাই, ফুল নাই, মাটি যেমন খেলার মাঠ। তুরা পারিস হামার ঢড়র (পেটের গর্ত) ভরাইতে? পারিস অন্ন দিতে?”^{১০}

-এই অভিযোগ শুনে ইউক্যালিপটাস গাছগুলি মরমে মরে যায়। তারা সগর্জনে বলে-

“আর না। এ অপমান আর সহ্য হয় না। বিট অফিসারের গাছের বিক্ষোভে শোনার ট্রেনিং নেই, যে বহেড়া। এক ঠসা ধর্মাবহেড়ার কারণে অন্নবালার ঐ দিককার ...আর নয়। চল। অন্নদা গোলদারের (অন্নদাপ্রসাদ কয়াল দীর্ঘকাল অন্নদা গোলদার নামে পরিচিত) গুদাম চল! তারা সযত্ন খণিত, রোদ ও কীটনাশকসেবিত ঢুপি বা ডুবি বা পিট ছেড়ে সাঁ সাঁ করে সিধা শূন্যে ওঠে ও অন্ন দে ! অন্নদা ! বলতে বলতে উত্তর-কাপকাটা নামক গঞ্জ জায়গার দিকে ধাওয়া করে।”^{১১}

বৃক্ষদের এহেন কর্মকাণ্ড পাঠকের কাছে গল্পটিকে জটিল এবং দুর্বোধ্য করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। স্বয়ং মহাশ্বেতা দেবী এ সম্পর্কে কী বলেছেন-

“সবুজের জন্য আমার তীব্র উদ্বেগ ছিল। পালামৌ, সিংভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া দেখেছি কি নির্মমতায় গাছকাটা চলেছে। ‘ডাস্ট অন দি রোড’ বইয়ে আমার যেসব ইংরেজি লেখার সংকলন আছে, তাতে দেখা যাবে স্বভাব অরণ্য উৎপাটন করে চূড়ান্ত অবিবেচনায় ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি ও সদৃশ গাছ দিয়ে তথাকথিত সামাজিক বনসৃজন কার্যসূচি চালাবার ফলে কীভাবে আমরা প্রকৃতির উপর অত্যাচার করে চলেছি। গণেশ দেবীর ‘নোমাদ কল্ড থিপ’ বইয়ে এক প্রবন্ধের প্রথম অংশে দেখেছি ‘একদা অরণ্য বার্তা পাঠাত জনপদে। অর্থাৎ, মহারাষ্ট্রের ওই অরণ্য অঞ্চলে বিশ্বাস ছিল অরণ্য দেবী হচ্ছেন ‘বাঘজাই’। তাঁ দূত হিসেবে আসত তাঁরই সেবক বাসুদেব। একটি পুরুষ মাথায় ময়ূরপুচ্ছ বেঁধে অরণ্যের বার্তা আনত জনপদে। গণেশ লিখেছেন- সেভাবেই অরণ্য চলে আসত জনপদে : দি ফরেস্ট দাস ভিজিটেস্ দা ভিলেজ।”^{১২}

‘অন্ন, অরণ্য...’ গল্পটিকে যদি আমরা এই প্রেক্ষাপটে বিচার করি, তাহলে দেখা যাবে গল্পটিতে মহাশ্বেতা দেবী বাস্তব, পরাবাস্তব, লৌকিক, অলৌকিক সমস্ত ঘটনার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ‘স্বভাব অরণ্য’ এবং ‘সমাজ অরণ্য’ -উভয়কেই তিনি ভাষা দিয়েছেন। লেখক বা অন্য কোনও চরিত্রের উপর নির্ভর না করে ‘অরণ্য’-রা নিজেদের কথা নিজেরাই বলেছে। আর গল্পের অন্যতম চরিত্র ভাতুয়া মেয়ে অন্নবালাকে অরণ্য দেবী ‘বাঘজাই’-এর দূত কল্পনা করা হয়েছে। আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে গল্পটির প্রায় সমস্ত চরিত্রের নামের সঙ্গে ‘অন্ন’ বা ‘অরণ্য’ শব্দটি যুক্ত আছে। গল্পে অন্নবালা ভাতুয়া মেয়ে হিসেবে কাজ করে জঙ্গল কাটা ঠিকাদার, কাঠচেরাই মিলমালিক, কাঠচালানি ব্যবসায়ী দিকপাল কর-এর বাড়িতে। পিতৃমাতৃহীন এই অন্নবালার দিকে কুদৃষ্টি দেয় দিকপাল করের ছোটো ছেলে অরণ্যচরণ ওরফে জংলি। মিথ্যে কথা বলে সে অন্নবালাকে গর্ভবতী করে। ফলস্বরূপ অন্নবালা অরণ্যচরণের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে এবং তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে অন্নবালা বাসুলির সামাজিক অরণ্য অর্থাৎ ইউক্যালিপটাসের জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এই ইউক্যালিপটাসের স্থলে পূর্বে ছিল স্বভাব অরণ্য অর্থাৎ আম-জাম-শাল-মহলের বন, সরকার কর্তৃক যা কর্তৃত্ব হয়েছে। গল্পকার মহাশ্বেতা দেবী সামাজিক অরণ্য বা ইউক্যালিপটাসের জঙ্গলকে তুলনা করেছেন শহরের চিত্তাক্ষম, বুদ্ধিমান বাবুদের সঙ্গে, যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় অন্নবালার মত দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতেও বিন্দুমাত্র ইতস্তত বোধ করে না। আবার শহরের সভ্য বাবুদের মতই ইউক্যালিপটাসের জঙ্গলকেও যে আদিবাসীরা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে না তাও গল্পকার দেখিয়েছেন। আর সেটা তিনি দেখিয়েছেন ইউক্যালিপটাসের নিজেদের ভাষাতেই-

“আদি বাসুলি ফরেস্টের শাল, পিয়াল, সিধা, মহল, আসান, অর্জুন, কেঁদ, পলাশ, শিমুল, কুসুম, জাম, আমলকী, বহেড়া বনতলের ঝোপ ও ঝাঁটি জঙ্গল তুঙ্গাপানি বিবিধ কন্দ, গাছলতা বেইঁড়, লোনা, তেতুল, এসব গাছ উচ্ছেদ করে ওরা এসেছে বলে ইউক্যালিপটাসরা মনে মনে স্ব-স্ব বিবেকের কাছে বড় অপরাধী। তাদের কথা শুনতে বিট অফিসার একান্ত অক্ষম। আছে, ইউক্যালিপটাসদেরও দুঃখ আছে। আমরা সমাজে অরণ্য, কিন্তু অরণ্যজীবী মানুষ আমাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। -কাটে, জ্বালায়, কাটে, জ্বালায়। -বাজনা বাজিয়ে আম ও মহল গাছের সঙ্গে বর কনেকে বিয়া দিয়ে তবে বিধি শালে নিয়ে বিয়া দিত। আমাদের ওরা সে কাজে যোগ্য মনে করে না। -সারহুল পরবে বনে ঢুকে না। -আমরা সিমপলি নট অ্যাকসেপটেড। বনবিভাগের নয়, জনগণের প্রাচীন ভালোবাসা চাই।”^{১৩}

কিন্তু, বিট অফিসার উৎপল সেন রায়ের ইউক্যালিপটাসের এই ভাষা বোঝার ক্ষমতা নেই। সে শুধু চাকরির জন্য ইউক্যালিপটাসের বিষয়ে স্তবকতা করে। তবে বাসুলি ফরেস্ট অফিসে দীর্ঘকাল আগে যে অফিসার ছিলেন তিনি আদি জঙ্গলের একশো বিঘা কাঁটা তারে ঘিরে দেন এবং বলেন-

“আমরা জঙ্গল খুন করছি। ঝাড়গ্রাম বা চিলাকিগড় রাজের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ছিল না। ফরেস্ট ছিল। পশুপাখি ছিল। অরণ্যজীবী মানুষ সহাবস্থান করত, জঙ্গল বাঁচিয়ে ব্যবহার করত। এখন গাছ কাটে। ...কাটতে ওরা বাধ্য হয়। এর পেছনের হতাশ বিপন্নতাটা বুঝো। আমি রেখে গেলাম। ভবিষ্যতে অরণ্য কী বস্তু, এখানটা দেখে শেখা যাবে। অরণ্য মানে ইউক্যালিপটাস, সরকার তাই করছে। এটা তার প্রতিবাদ।”^{১৪}

-প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে অরণ্য যা হওয়া উচিত এটি তার একটি ক্ষুদ্র প্রতিনিধি। বিট অফিসার উৎপল সেন রায় যেমন ইউক্যালিপটাস গাছদের আহত অভিমান বাণী শোনে না, বাসুলি রিজার্ভ ফরেস্টের স্বভাব অরণ্য মন্ত্রের গাছগুলির কথাও তেমনই বোঝে না। এই গাছগুলিও তার উপর ক্রুদ্ধ, তারা বলে-

“আমরা ছড়িয়ে পড়তে চাই। -আমাদের আদি এলাকায় যেতে চাই। -আমরা সংরক্ষণে বাঁজা হয়ে থাকতে চাই না। -অরণ্যজীবী মানুষদের কাজে লাগতে চাই।”^{১৫}

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে গল্পে অন্নবালা হচ্ছে দেবীর দূত। তাই তার ধিক্বারে ইউক্যালিপটাস গাছগুলি নিজেরাই যায় অন্নদাপ্রসাদ কয়াল-এর গুদামে চাল লুণ্ঠ করতে, যে চালের অনেকটাই আদিবাসী এলাকার M.R.Shop-এ বিক্রি না করা চাল। ওদের রেশনের চাল অন্নদাপ্রসাদ গোলায় তোলে এবং হাটে ওদের কাছেই দ্বিগুণ দামে বিক্রি করে। জানালা খুলে এই অন্নদাপ্রসাদ শোনে নিঃশব্দে গর্জন-

“অন্ন দে ! অন্নদা ! অন্নদাকে অন্ন দিতে হবে, দিতে হবে। সমাজ অরণ্য জিন্দাবাদ। এবং সে দেখে দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছ সকল ডালপালা ও ডগাকে বলিষ্ঠ হাত হিসেবে ব্যবহার করে ধমাদম গুদামের জাত ভেঙে ফেলছে। চালের বস্তা তুলে নিচ্ছে, -ইউক্যালিপটাস সকল চালের বস্তা বড় ক্ষমাপ্রার্থীর মতো অন্নকে ঘিরে সাজিয়ে দিতে থাকে।”^{১৬}

কারণ, অন্নই অরণ্য এবং অরণ্যই অন্ন’ -একথা ইউক্যালিপটাসরাও জানে। অতঃপর ‘দখলদারি ! নিকাল যাও ! দখলকারিরা নিকাল যাও !’ শালমহলের এই হিসহিসে ধিক্বার শুনে তারা সনিশ্বাসে শূন্যে ওঠে এবং ফরেস্ট বাংলোর নির্দিষ্ট একশো বিঘায় গিয়ে বসে যায়। অন্যদিকে অন্নবালার দুঃখ দেখে রিজার্ভ ফরেস্টের স্বভাবঅরণ্যখণ্ড চলে আসে ইউক্যালিপটাসদের জঙ্গলে নিজেদের মধ্যে পরস্পর স্থান বিনিময় করে। স্বয়ং বনদেবী বলেন-

“বন আমি সিজর্জে দিচ্ছি বাছা সকল। বাঘুত-বড়াম ও বাসুলি সেমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন নিজেদের। এবার এ সংবাদ বাতাস টেলিগ্রাফ পাঠায় জামবণী, নারায়নগড়, শালবনী দিকে দিকে। ‘বাসুলি জঙ্গল ফিরে এসেছে, বলে লধ, কোড়া, মাহালি, সাঁওতাল, মুণ্ডা নানা জাতি সাঁ সাঁ করে এসে পড়ে। বাঘুত থানে অন্নবালা মায়া ঘুমে অচেতন। পালনি মা ওর মাথার নীচে একটি বস্তা গুঁজে দেয়। আর ধীরে ধীরে, জনচক্ষু থেকে বনটি অদেখা হয়। মায়া বন হয়। দেখতে পায় না কেউ, ঢুকতে পারে না কেউ। অদৃশ্য আড়াল থেকে শোনা তরুণীদের হাসি, শিশুর কান্না, জলের কলতান, ধানসা মাদলের বাজনা, ফুটন্ত ভাতের বাস নাকে আসে। অরণ্যের সংসার যেন।”^{১৭}

-এভাবেই এক লৌকিক কাহিনি ব্যবহার করে মহাশ্বেতা দেবী সমাজ অরণ্যের তুলনায় স্বভাব-অরণ্যের প্রয়োজনীয়তার কথাই বলতে চেয়েছিল। আদিবাসী সমাজ এবং অরণ্য উভয়েই উভয়ের কাছে নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে একের স্বার্থ নষ্ট হলে অপরের অস্তিত্বও বিনষ্ট হয়। তখন বিপ্লব ঘটে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও। তাই মহাশ্বেতা দেবী এমন এক অরণ্যের স্বপ্ন দেখেছেন যা ফুল দেয়, ফল দেয়, ছায়া দেয় আর বাঁচিয়ে রাখে তার অরণ্য সন্তানেরও।

প্রায় একই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত ‘শূন্যস্থান পূর্ণ করো’ গল্পটি। গল্পের প্রেক্ষাপট সিংভূমের অন্তর্গত হলদি গ্রাম। সরকারি অর্থনীতিতে সেগুন গাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেগুনে শতকরা লাভ। সেগুনের দেহজাত আঠা জল ও কীট প্রতিরোধ করে। সকল রকম স্থায়ী কাজে সেগুন লাগে। সেগুন গাছের সিলিং হাজার বছর ধরে টিকে থাকে। তাই সরকার চায় হলদি গ্রামে শাল গাছের পরিবর্তে সেগুন গাছ লাগাতে। কিন্তু গ্রামের আদিবাসীরা চায় শাল গাছটি থাকুক। কারণ-

“শাল গাছটা আদিবাসীদের কাছে প্রায় একটি ধর্মীয় দেবতা। সেগুন মূল্যবান রাজ্য ও জাতীয় অর্থনীতিতে। শাল মূল্যবান আদিবাসী অর্থনীতিতে। শাল কাঠ, বীজ, পাতা ওদের নানাভাবে বাঁচায়। মছয়াও তাই। সরকার এখন শাল ও মছয়া কেটে সেগুন লাগাচ্ছে। আদিবাসীরা স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ। গরমকালে খাদ্যশস্যে টান পড়ে।

মহুয়া ফুল ওরা কাঁচা খায়, পাপড়ি শুকিয়ে গুঁড়ো করে চাপাটিও ভেজে খায়। ফুল থেকে মদ করে। আর ফল ও বীজ থেকে বের করে তেল।”^{১৮}

-তাই হলদি গাঁয়ের আদিবাসীরা সরকারের বিরুদ্ধে ‘শাল বাঁচাও, সাগোয়ান হটাও’-আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ভুজঙ্গ মাহাতো আর শশী মাহাতো। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আদিবাসীরা এ আন্দোলন করতে থাকে, কারণ ওই আন্দোলন তাদের অন্তরতম চাহিদাগুলির উত্তর। এ সংগঠিত আন্দোলন গড়ে উঠতে পেরেছে একেবারে গ্রাসরুট পর্যায়ের সমর্থন পেয়েছে বলে। প্রথমদিকে আন্দোলনটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক থাকলেও ধীরে ধীরে তা হিংস্র রূপ নেয়। সরকারের কাছ থেকে আদিবাসীরা কোনও সাহায্যই পায় না। কারণ ভুজঙ্গ, শশীরাও একে তো আদিবাসী, তার ওপর হরিজন। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশেও যাদের কোনও মূল্য নেই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরও দশকে দশকে এরা সরকারি বন্দুকের নিশানা মাত্র। তাই আদিবাসীদের তিরের পরিবর্তে চলে সরকারি অফিসারদের বন্দুকের গুলি। শশী, ভুজঙ্গসহ মারা যায় হলদি গ্রামের প্রায় সকল যুবাপুরুষ। আর তাদের সংগ্রামের, প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক উন্নত, সুবিশাল শালগাছ, যে গাছ স্বপ্ন দেখায় এক স্বপ্নময় ভবিষ্যতের।

‘জল’ গল্পের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল হলেও জলের জন্য হাহাকার যে কখনও কখনও কত তীব্র হতে পারে তার উদাহরণ মহাশ্বেতা দেবীর ‘অগ্নিগর্ভ’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত ‘জল’ নামক গল্পটি। এই গল্পের মূল মানবিক কেন্দ্রে রয়েছে মঘাই, যে পাতালে জলের খোঁজ রাখে। রাতভর উপোসি থেকে সকালে স্নান করে কাচা কাপড় পরে, পলাশ পাতায় চাল-ঘি-চিনি নিয়ে, মন্ত্র পড়েও হাঁটতে থাকে। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে আঁজলা উছলে চাল ফেলে দেয়। সেখানে ডিনামাইট দিয়ে ফাটালেই জল ওঠে, কুয়ো হয়। কিন্তু সেই কুয়োর জল মঘাইরা পায় না। রিলিফের টাকায় তৈরি কুয়োগুলোও থাকে বর্ণহিন্দুদের দখলে। প্রকৃতির গর্ভ হতে যে জল আসে, মঘাইয়ের বিশেষ ক্ষমতার ওরসে যে জল জন্ম নেয় চরসার রক্ষ ভূমিতে, তাতে তারই অধিকার নেই -এটাই মঘাই ও মঘাইদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। নিজেদের জল আনতে মঘাইয়ের চরসা নদীর বুকে উনুই খুঁড়তে হয়-

“সারারাত চরসার উনুইয়ে বিন্দু বিন্দু জল জমে। ভোর হবার আগে ডোম-চামার-চাঁড়ালরা মেয়েতে-বউতে-মাতে সে জল তুলে নেয়। পুব আকাশ লাল করে খরার সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ওঠে। তাপে উনুইয়ের জল উপে যায়। পাহাড় ধরে মেয়েরা জলপাত্র নিয়ে ফেরে। আকাশের পটভূমিতে তাদের অপার্থিব মনে হয়।”^{১৯}

এই মঘাই-এর সঙ্গে পরিচয় হয় জিতেন মাইতির। তিনি চরসা ব্লকে বুনিয়াদি প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। এই গ্রামে মাস্টারি করতে এসে তিনি বোঝেন সংবিধান যতোই বলুক উচ্চ-নীচ, সুজাত-কুজাত বলে কোনও ভেদাভেদ নেই, কিন্তু বাস্তবে তা কখনও ঘটে না। তাঁর স্কুলে বর্ণহিন্দুদের ছেলে-মেয়েরা পড়তে আসে। উঁচু জাতের গৌরবেই সরকারি টাকায় তৈরি কুয়োগুলো থাকে বর্ণহিন্দুদের দখলে, যে কুয়ো থেকে গোরু-মহিষেরা স্নানের জল পেলেও ডোম-চামার-চাঁড়ালরা তেষ্টার জল পর্যন্ত পায় না। মূলত জিতেন মাইতিরই প্রচেষ্টায় মঘাইরা চরসার বুকে সবাই মিলে তৈরি করে বাঁধ, যাতে ওই মাটির আদি মানুষেরা একটু জল পায়। কিন্তু তিন পুরুষ ধরে রিলিফ চুরিই যার পেশা, সেই সন্তোষ পূজারি, এস.ডি.ও. তথা সরকার তা হতে দেয় না। জনগণের স্থায়ী জল-সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে তাদের এই দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে, তাই বাঁধ নির্মাণকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। তাদের মতে জিতেন, মঘাই, তার ছেলে ধুরা, সকলেই ‘ফরলং সাসপিশাস্ ক্যারেকটার’। মঘাই বাধা দেয় পুলিশকে। পুলিশের লাঠিতে শায়িত জিতেন দেখে-

“মঘাই শূন্যে দেহটি বেঁকিয়ে আর্চ করে জলে পড়ছে। তার শরীর শূন্যে, পেছনে সূর্য, রক্তাক্ত ইকেরাস যেন, তারপর ‘আহ-আহ’ আর্থনাদ ও জলে পড়ার ঝপাং শব্দ হয়। জিতেন মাইতি ও ধুরা জেলে। অপরাধ আই.পি.সি ১৪৬, ১৪৭, ১৫১ ধারা। চরসা নদী এখন আগের মত শীর্ণ, জলহীন, প্রাচীন বক্ষ্যাহে অভিশপ্ত। তার বুকে ডোম-চামার-চাঁড়াল পুরুষরা রাতে উনুই খোঁড়ে। সে উনুইয়ে জল জমে। মেয়েরা ভোর রাতে সে জল নেয়। ...চরসায় এখনও আর্থিক গতি-বার্ষিক গতির অবশ্যম্ভাবিকতায় খরা-বান-খরা হয়। সন্তোষ পূজারি রিলিফ আনতে যায় বছর বছর। চরসা গ্রামে জলাধিক্য ঘটায় ফলে রিলিফ থেকে কুয়ো খোঁড়ার সরকারি স্যাংশন নেই। রিলিফের টাকায় মন্দির উঠবে। নেসেসারি পাবলিক বিলডিং শ্রেণীমতে।”^{২০}

-গ্রীক পুরাণের ইকেরাসের মতো মঘাই ডোমও ডানা বেঁধে সূর্যের কাছাকাছি বা স্বপ্নের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিল নিজের অধিকার ও জল পাওয়ার স্বপ্নে। কিন্তু শাসক ও পুলিশের লাঠির আঘাতে তার সেই স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নদীতে আছড়ে পড়ে। ‘রক্তাক্ত ইকেরাস’-এর এই রূপকটি মহাশ্বেতা দেবী অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করেছেন। গল্পশেষে গল্পকার দেখিয়ে দেন- মঘাইদের বাস্তব অবস্থা রয়ে যায় সেই অন্ধকারেই, যেখানে নিচু জাতের মানুষদের রাতে নদীখাতে উনুই খুঁড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল জমিয়ে তৃষ্ণা মেটাতে হয়। আর সরকারি খাতায় নোট লেখা হয়-

“চরসা ব্লকে হরিজন-সমস্যা জাতীয় কোনো সমস্যা নেই। জল-সমস্যাও নেই। জল, দুরভিসন্ধি অ্যাজিটেটরদের তৈরি একটি ‘ইস্যু মাত্র’।”^{১১}

Conclusion: পরিশেষে বলা যায়, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে প্রকৃতি কেবল রূপ-রস-সৌন্দর্যের নিছক পটভূমি বা অলংকার হিসেবে উপস্থিত হয়নি; বরং তা আদিবাসী ও শোষিত মানুষের জীবনসংগ্রাম, আত্মপরিচয় এবং সামাজিক বঞ্চনার এক গভীর প্রতীকি মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে শুষ্ক রক্ষ প্রান্তর যেমন প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনাকে প্রতিফলিত করে, তেমনই শাল ও অর্জুন গাছ হয়ে ওঠে আদিবাসীদের সংস্কৃতি, আত্মসম্মান ও প্রতিরোধের প্রতীক। অন্যদিকে সামাজিক বনসৃজনের নামে কৃত্রিম বনায়নের বিরুদ্ধে প্রকৃতির নিজস্ব প্রতিবাদ ফুটিয়ে তুলে মহাশ্বেতা দেবী প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষার বার্তা দিয়েছেন। প্রকৃতি প্রদত্ত মৌলিক সম্পদের ওপর দরিদ্র মানুষের অধিকারহীনতা ও শাসনের নির্মম শোষণের করুণ চিত্রও প্রকাশ পেয়েছে। সংক্ষেপে, মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পসমূহে প্রকৃতি ও অরণ্যজীবী মানুষকে এক অভিন্ন সূত্রে গেঁথেছেন। প্রকৃতি এখানে শোষিতের সহযোদ্ধা, সংস্কৃতির রক্ষক এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক নীরব অথচ বলিষ্ঠ প্রতিবাদী সত্তা। গল্পকার মহাশ্বেতা হিসেবে শুধু নয়, ব্যক্তি মহাশ্বেতাও সেই প্রকৃতিতেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতীকরূপে বেঁচে আছেন আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতায় যখন গান-স্যালুটের তোড়জোড় চলছে, পুরুলিয়ায় চাকা নদীর ধারে তাঁর কিছু আপনজন একটা সেগুন গাছের চারা পুঁতে নাম দিয়েছিলেন- ‘মহাশ্বেতা’।

Reference

- (১) গোস্বামী, বিজনবিহারী। (১৩৫৮)। অথর্ববেদ, হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৪১০
- (২) দেবী, মহাশ্বেতা। (১৯৯৯)। মহাশ্বেতা দেবীর বাছাই গল্প, ভারতবর্ষ, মণ্ডল বুক হাউস, পৃষ্ঠা- ২৭৮
- (৩) পূর্বোক্ত, ভারতবর্ষ, পৃষ্ঠা- ২৭৯
- (৪) দেবী, মহাশ্বেতা। (১৯৯৬)। মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, অর্জুন, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ৫৮৩
- (৫) পূর্বোক্ত, অর্জুন
- (৬) পূর্বোক্ত, অর্জুন, পৃষ্ঠা- ৫৮১
- (৭) পূর্বোক্ত, অর্জুন, পৃষ্ঠা- ৫৮১-৫৮২
- (৮) পূর্বোক্ত, অর্জুন, পৃষ্ঠা- ৫৮৩
- (৯) পূর্বোক্ত, মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, বিহন, পৃষ্ঠা- ১৮৮
- (১০) পূর্বোক্ত, মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, অন্ন, অরণ্য..., পৃষ্ঠা- ৬০৩
- (১১) পূর্বোক্ত, অন্ন, অরণ্য...,
- (১২) দেবী, মহাশ্বেতা। (১৯১৮)। অরণ্যের অধিকার এবং..., অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৯-১০

- (১৩) পূর্বোক্ত, অন্ন, অরণ্য..., পৃষ্ঠা- ৬০১
- (১৪) পূর্বোক্ত, অন্ন, অরণ্য..., পৃষ্ঠা- ৬০২
- (১৫) পূর্বোক্ত, অন্ন, অরণ্য...
- (১৬) পূর্বোক্ত, অন্ন, অরণ্য..., পৃষ্ঠা- ৬০২-৬০৩
- (১৭) পূর্বোক্ত, অন্ন, অরণ্য..., পৃষ্ঠা- ৬১০
- (১৮) পূর্বোক্ত, মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, শূন্যস্থান পূর্ণ করো, পৃষ্ঠা- ২৯৪-২৯৫
- (১৯) পূর্বোক্ত, মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, জল, পৃষ্ঠা- ৪২০
- (২০) পূর্বোক্ত, জল, পৃষ্ঠা- ৪৩৪
- (২১) পূর্বোক্ত, জল

Citation: Roy. T., (2026) “মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে শোষিতের সহযোদ্ধা রূপে প্রকৃতির প্রতীকে উত্তরন”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-06, June-2026.